দৈনিক খবর 24

তারিখ 28 JUN 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

দুই হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা

।। অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল ।।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

নৈরাজ্য প্রতিকারের কতিপয় সুপারিশঃ

১। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন এক দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। যেহেতু রাতারাতি সমাজ কাঠামো পরিবর্তনে কোন সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায় নেই, তাই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় না থেকে শিক্ষাঙ্গনকে যতদূর সম্ভব সামাজিক অস্থিরতামুক্ত রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রেখে সঠিক জীবনদর্শনের দিকনির্দেশ এবং কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ ও সহায়তাদান করা যায় তবে তাদেরকে অনেকাংশে মানসিক অস্থিরতামুক্ত রাখা সম্ভব হবে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং উদ্যোগ প্রকাশে উৎসাহদানের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে তারা মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

২। সরকারী-বেসরকারী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সকল শূন্যপদ পূরণ করে নিয়মিতভাবে প্রত্যেকটি ক্লাস অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সহ ও বহিঃপাঠক্রম কর্মকান্ডে নিয়োজিত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। সমাজের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কুফল প্রচারের মাধ্যমে জনমনে সচেতনতার উন্মেষ সাধন, প্রশাসনিক দৃঢ়তা ও সদিচ্ছা এবং পরীক্ষায় নতুন ধারার প্রশ্নপত্র প্রণয়নের মাধ্যমে নকল প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা বাধ্য হয়েই পড়াশুনার প্রতি আন্তরিক ও যত্নবান হবে এবং এতে করে তাদের মানসিক অস্থিরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানঃ

ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা মূল্যায়ন এবং পাঠবিষয়ে জ্ঞানার্জনের মাত্রা পরিমাপের লক্ষ্যে কোর্স সমাপনান্তে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান বহুকালের প্রচলিত রীতি। কিন্তু পরীক্ষার হলে সন্ত্রাসী তৎপরতা, ব্যাপক গণটোকাটুকি ইত্যাকার কারণে বর্তমানে পরীক্ষা পরিচালনা এক দুঃসহ ব্যাপার। একথা অকপটে স্বীকার করতে কারো কুণ্ঠাবোধ থাকার কথা নয় যে, পরীক্ষার নামে বর্তমানে যে প্রহসন চলছে তা সমগ্র জাতির ভবিষ্যতের জন্য এক অশনি সংকেত।

শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ও পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন- এ দু'টি বিষয়ের একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক নিবিড়। পরীক্ষার্থীরা কেন পরীক্ষায় নকল করে, এ জন্য কেবলমাত্র তারাই দায়ী কি-না- এ সব বিষয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। এ কথা অনস্বীকার্য যে, পরীক্ষায় নকল প্রবণতার জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা এককভাবে দায়ী নয়। শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা এবং শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান বিঘ্নিত হওয়া, উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা ও সে ক্ষেত্রে সত্যিকারের মেধা বিচারের পরিবর্তে কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলাফলকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা, কর্মসংস্থানের অভাবে চাকরিক্ষেত্রে প্রচন্ড প্রতিযোগিতা এবং সেক্ষেত্রেও কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলাফলের উপর গুরুত্ব প্রদান ইত্যাকার কারণে যে কোন উপায়ে পরীক্ষায় ভাল ফল করার চিন্তা পরীক্ষার্থীদের মনে প্রবলভাবে ক্রিয়া করে। ফলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন যে একটি গর্হিত কাজ এ কথা জেনেও তারা এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং বাধাগ্রস্ত হলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এছাড়া একশ্রেণীর শিক্ষকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা, রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা, অভিভাবক মহলের একাংশের অল্পচেতনতা প্রসূত সহযোগিতা ও সমর্থন এবং প্রশাসনিক [illegible]তা ও [illegible] অভাব পরীক্ষার্থী[illegible] অবলম্বনে [illegible] তাবস্থায়, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা রোধে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে।

১। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করে এর যথাযথ সংস্কারের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। প্রচলিত পদ্ধতির ত্রুটিপূর্ণ দিকসমূহের অন্যতম হচ্ছে গতানুগতিক ধারার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এক বছর অন্তর অন্তর প্রায় একই প্রশ্ন সেট করা হয়। ফলে কোন্ বছর কোন্ ধরনের প্রশ্ন হবে তা পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অনুমান করা কষ্টকর হয় না। তাই তারা প্রত্যেক বিষয়ে গুটিকতক বাছাই করা প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে এবং উত্তরপত্রে লিখে দিয়ে আসে। এমতাবস্থায় প্রশ্নপত্র প্রণয়নে গতানুগতিকতা পরিহার করে নতুন ধারার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। প্রস্তাবিত ধারায় সমগ্র প্রশ্নপত্রের শতকরা পঁচিশভাগ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী, শতকরা পঁচিশভাগের উত্তর সংক্ষিপ্ত (এক লাইন থেকে দুই লাইনের মধ্যে) এবং বাকী শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উদ্দেশ্যমূলক হতে পারে। একই সংগে সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র যেন পুরো সিলেবাস জুড়ে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। শিক্ষার সকল স্তরে ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকপদ সৃষ্টি করে সকল পদ পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। প্রত্যেক স্তরের প্রতিটি পরীক্ষা যথাসময়ে অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা বিধান এবং পরীক্ষার ফলাফল দ্রুত প্রকাশের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে পরবর্তী সেশনের পাঠদান যথাসময়ে শুরু করা ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোর্স সমাপ্ত করা সম্ভব হয়।

৪। এসএসসি থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত সকল স্তরের পাবলিক পরীক্ষা কেবলমাত্র জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হতে হবে। মফস্বলের কলেজগুলোতে বহুসংখ্যক শিক্ষকের পদ শূন্য থাকলেও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে ঢাকা শহরের কলেজগুলোতে কোন পদ খালি থাকে না। এ অবস্থার নিরসন প্রয়োজন।

৫। শিক্ষার সকল স্তরের গৃহশিক্ষকতা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬। উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকরি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরীক্ষার ফলাফলকে গুরুত্ব না দিয়ে মেধা যাচাই- এর মাধ্যমে যোগ্যতা নির্ধারণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে ঐ দু'টি সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত হারে ক্লাসে উপস্থিতির যে বিধান রয়েছে তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৮। শিক্ষকদের অধিকতর কর্মসূচী ও শিক্ষকতাকে আকর্ষণীয় পেশায় পরিণত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ আর্থিক সুবিধাদানের মাধ্যমে এই পেশায় সর্বোৎকৃষ্ট মেধা আকর্ষণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য অন্যান্য পেশার চাইতে অধিক সুযোগ- সুবিধা বিশিষ্ট পৃথক বেতন স্কেল প্রবর্তন করতে হবে।

৯। পদোন্নতির ক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি না করে যথাসময়ে শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল পদে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগ করতে হবে। দায়িত্ব ও ক্ষমতা পরস্পরের পরিপূরক। প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার [illegible] উপর অধিকতর [illegible] বাহনীয়।

উপসংহারে শিক্ষা প্রশাসনকে গতিশীল ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এর কাঠামোগত সংস্কার সম্পর্কে [illegible] বিষয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই। সরকার জনস্বার্থে প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন করেছেন। শিক্ষা প্রশাসনে এই বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত অপরিহার্য হলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, সারা দেশের সমস্ত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের বিভিন্ন বিষয় এবং সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব একমাত্র সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, আর্থিক বিষয়াদি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলী, ছুটি মঞ্জুর ইত্যাকার যাবতীয় কাজ উক্ত সংস্থার দায়িত্বের আওতাধীন। ফলে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজে ছুটতে হয় ঐ দপ্তরে।

তাই স্বাভাবিক কারণেই উক্ত সংস্থার কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী। যার ফলে যে কোন বিষয় নিষ্পত্তি কিংবা কোন জরুরী সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বহুবার যোগাযোগ করে অথবা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও প্রয়োজনীয় সমাধান পাওয়া যায় না। ফলশ্রুতিতে প্রায়ই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, মাত্র চারটি সরকারী কলেজকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে যে সংস্থার জন্ম, এর কলেবর সামান্য বৃদ্ধি পেলেও বহুবিধ সমস্যার আবর্তে ঘূর্ণায়মান দু'শতাধিক সরকারী কলেজ, চারশতাধিক বেসরকারী কলেজ এবং কয়েক হাজার সরকারী- বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ এ সংস্থার পক্ষে কেবল অসম্ভব নয়, অবাস্তব। তাই প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ হচ্ছেঃ

১। সাবেক বিশটি জেলায় বিশটি আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হোক। আঞ্চলিক অফিসসমূহ সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বদলী, ছুটি মঞ্জুর ইত্যাদি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করবেন।

২। মহাপরিচালকের অধিদপ্তর নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং আঞ্চলিক দপ্তরসমূহ মহাপরিচালকের দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নীতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

৩। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন তদারকি ভার আঞ্চলিক দপ্তরসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং মহাপরিচালকের অধিদপ্তর- এর জন্য প্রতি অর্থবছরে দেশের সকল অঞ্চলের জন্য সুষম নীতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দ করে তা আঞ্চলিক অফিসের কাছে ন্যস্ত করবেন।

৪। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের আর্থিক দায় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। তবে সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত নীতির ভিত্তিতে তা বাস্তবায়িত হলে সে দায় বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব হবে। যেমন বর্তমানে প্রতিটি জেলায় একটি করে জেলা শিক্ষা অফিস রয়েছে। সেক্ষেত্রে ঐ সংস্থাকেই যদি আঞ্চলিক দপ্তরে রূপান্তরিত করা হয় তবে বড়রকমের কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র বিশটি আঞ্চলিক পরিচালকের পদ সৃষ্টি করে এবং জেলা শিক্ষা অফিসারের পদবী সহকারী পরিচালক পদে উন্নীত করে জেলা শিক্ষা অফিসকেই আঞ্চলিক পরিচালকের দপ্তর হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বর্তমানে দেশের আটটি অঞ্চলে আটটি উপ-পরিচালক এবং মহাপরিচালকের দপ্তরে কয়েকটি উপ-পরিচালকের পদ রয়েছে। উক্ত পদগুলো বিলুপ্ত করে এ সকল পদে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণকে আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করে সরকারের আর্থিক দায় লাঘব করা যেতে পারে।

৫। শিক্ষক স্বল্পতাহেতু একদিকে যেমন পড়াশুনা বিঘ্নিত হয় অপরদিকে একই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোজন বন্ধ থাকে। শিক্ষক নিয়োগ ও উপযোজন প্রদানের নিয়ম মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ দায়িত্বের আওতাধীন থাকায় ঐ সকল সংস্থার সমন্বয়ের অভাবে এ বিষয়ে সৃষ্টি হয় জটিলতা। অতএব, উক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কেবলমাত্র একটি সংস্থার উপর শিক্ষক নিয়োগ ও উপযোজনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা একান্ত অপরিহার্য।

পরিশেষে বলতে চাই, প্রচন্ড ঝড়ে বালির ঢিবিতে মুখ লুকিয়ে রাখা উটপাখির ন্যায় আমরা যদি শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রকৃত সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিই, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। দিন যত যাচ্ছে সমস্যা হচ্ছে তত ঘনীভূত। তাই যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের যৌথ প্রয়াস ও উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ যথাযথভাবে চিহ্নিত করে সংকট উত্তরণের সঠিক পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

সরকার ২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রম ও নীতি সকলের কাছে সুস্পষ্ট না হলেও এ মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সকলেই একমত। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। তাই সার্বিক জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই যতো দ্রুত সম্ভব সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।